বাংলা সংস্কৃতি: চাই আর একটি ভাষা-বিপ্লব -৩

যুবায়ের হাসান

আগের সংখ্যাটি দেখতে হলে এখানে টোকা মারুন

বাংলাদেশ সৌভাগ্যক্রমে: একটি একভাষিক দেশ, ভারত বা পৃথিবীর আরো অনেক দেশের মতো বহুজাতিক নয়। এই দেশগুলিতে ভাষাগত বিষয়ে বাস্তব সমস্যা বিরাজ করছে ফলে ইংরেজী বা অন্য কোনো ঔপনিবেশিক ভাষার প্রতিষ্ঠা সহজ হয়েছে। কিন্তু একভাষিক দেশ হওয়ার সুবর্ণ সুযোগটি হেলাফেলায় নষ্ট করে অযাচিতভাবে এদেশে শিক্ষা ও প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে ইংরেজী বন্দনা করা হচ্ছে। চীন, জাপান বা ইউরোপের কথা বাদই দিলাম, আমেরিকার নৈকট্যধন্য দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ডের মতো দেশেও শিক্ষা ও গণযোগাযোগের সর্বক্ষেত্রে নিজ নিজ ভাষা ব্যবহার হচ্ছে অত্যন্ত সার্থকতার সাথে। বস্তুত: উন্নত বা বিকাশমান দেশগুলিতে শুধুমাত্র গবেষণা কাজ ও বহি:দেশীয় যোগাযোগের সুবিধার্থে সমাজের একটা ক্ষুদ্র শ্রেণী বিদেশী ভাষার জ্ঞান রাখতে চেষ্টা করে, বৃহত্তর সমাজে এদেরকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

উচ্চ মধ্যবিত্তশ্রেণীর অন্ত:রশূন্যতার কারণে রাজধানী ঢাকায় আজ ইংরেজীর দাপট দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে অধোস্তরীয় আঞ্চলিক ভাষার অদ্ভুতুড়ে খিচুড়ি। দু:খের বিষয়, বহু ত্যাগ ও রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতার পর তিনযুগ অতিক্রান্ত হলেও এ বিষয়ে পাওয়া যায়নি কোন দিকনির্দেশনা।

গ্রামীণ বাংলার চিত্রটিও খুব আশাব্যঞ্জক নয়। সেখানে, মাদ্রাসা শিক্ষার নামে বাংলার চেয়ে ধর্মীয় ভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বেশি এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিরাট একটা অংশ উপায়ন্তর না দেখে এধরণের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।
যে পর্যায় থেকে আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক শিক্ষা প্রসার ও পরগাছা শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ ও সংস্কার প্রস্তাব আসা উচিত সেই মহল কাজটি করেছেন না কিংবা বিশেষ কোনো অভিপ্রায়ে পুরো বিষয়টি দেখেও না দেখার ভান করছেন। আধুনিক একটা রাষ্ট্রের আন্ত:সংগঠন ও বিকাশে এই নির্লিপ্ততা সুদূরপ্রসারী ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

আজ যেমন ইংরেজী নিয়ে সমাজের একটা সুবিধাভোগী শ্রেণী বাড়াবাড়ি করছে, মধ্যযুগে এবং মধ্যযুগের পরে, এই সুবিধাবাদী শ্রেণীই সংস্কৃত ও ফারসি ভাষাকে রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে অপচেষ্টা চালিয়েছিল। এদের তঞ্চকতা, ভ্রষ্টাচার ও অপক্রিয়াতে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে, সেই আলো আঁধারির যুগে উত্তর বাংলার এক অখ্যাত কবি আব্দুল হাকিম লিখেছেন:

যে সব বঙ্গেত জন্মি হিংসে বঙ্গবাণী
সে সব কাদের জন্ম নির্ণয় ন জানি।
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না জুয়ায়
নিজ দেশ ত্যাগী কেন বিদেশ ন যায়।

উনবিংশ শতাব্দিতে কলকাতা কেন্দ্রীক রেনেসাঁস বাংলা সংস্কৃতির প্রতিটি শাখাকে করেছে অভাবিত সমৃদ্ধ----আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের জোয়ারে পুষ্ঠ। সাহিত্য, সঙ্গীত, নাটক, বিজ্ঞান ব্যবসা-বাণিজ্যসহ জীবনের সকল ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় উন্নতি ঘটেছে। স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ মানুষ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাধীন স্বদেশের আশায় বাঙ্গালি অনেক ত্যাগস্বীকারও করে, কিন্তু ১৯৪৭ সালের দ্বিখন্ডিত স্বাধীনতা বাঙ্গালির স্থায়ী বিপর্যয়ের কারণ হয়ে উঠে। বাস্তবে, বাঙ্গালির স্বদেশ চেতনা ছিল গোঁজামিল দিয়ে ভরা, বাঙ্গালিত্বের চেয়ে অন্যতর পরিচিতি মূখ্য হয়ে দাঁড়ায়। এর খেসারত পূর্ববাংলার চেয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষকে দিতে হয়েছে অনেক বেশী। সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের যাঁতাকলে পড়ে বাংলা হারিয়েছে তার আপন স্বকীয়তা আর স্বাতন্ত্র্যবোধ। এ ক্ষতি অপূরণীয়, অমোচনীয় অবস্থানে এসে আজ দাঁড়িয়েছে। এমনকী, বাংলার সাংস্কৃতিক রাজধানী কলকাতাতে এর মূল বাসিন্দারাই সর্বতোভাবে কোনঠাসা হয়ে পড়েছে। স্বদেশচেতনা আর আত্মত্যাগের উলটো পিঠে বাস্ত বতার কী নির্মম পরিহাস ! কলকাতা তথা পশ্চিম বাঙ্গালির এই অধ:পতন আর অবক্ষয়ের চিত্রটি প্রখ্যাত সাহিত্যিক বুদ্ধদেব গুহর আত্মজীবনী থেকে তুলে ধরছি:

> কোলকাতা তখনও পুরোপুরি বাঙ্গালিদেরই শহর ছিল। হয়েতো গরিব ছিল, হয়তো এত চাকচিক্য ছিলনা, কিন্তু তার বাঙ্গালিয়ানাতে কোনও ফাঁকি ছিলনা। .... বাঙ্গালি তখন বাঙ্গালির পোশাক পরত, বাঙ্গালি খাবার খেত, নিজেদের বাঙ্গালি বলে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করত। ---------- উনিশশো বাহান্নতেও কোলকাতার মালিক বাঙ্গালিরাই ছিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যে চাকুরি বেসরকারী ও সরকারী দোকানদারী এসব অধিকাংশই তখনও বাঙ্গালিদের হাতেই ছিল। এখন বিরানব্বইতে এসে বাঙ্গালিদের খুঁজে বার করতে হয়।

পশ্চিম বাংলায় বাংলা সংস্কৃতির বিপদ এক নজিরবিহীন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। সংস্কৃতির এই সংকটের গভীরতা তুলে ধরতে কোলকাতারই পত্রিকা থেকে আরো কয়েকটি উদ্ধৃতির আশ্রয় নিচ্ছি:

১. বড়ই উদার এ শহর, কিন্তু মনের অতলে কাজ করে অন্তর্লীন প্রাদেশিক সংকীর্ণতা। কলকাতা প্রাদেশিক সংকীর্ণতা পোষণ করে বলেই বোধহয় মহানগরীর লিঙ্গুয়া ফ্রাংকা আজ হিন্দিতে পর্যবসিত হয়েছে। পেটে ক্ষুধার উদ্রেক হলেই ভূ-ভারতের বুভুক্ষু জনগণ এ শহরে ছুটে এসে অনায়াসে ফুটপাত দখল করে নিতে পারে, একবর্ণ বাংলা না শিখেও দিব্যি মাধ্যমিক স্তর উত্তীর্ণ হওযা যায়, এমনকী রাজ্য সরকারী চাকরিতেও প্রবেশ করা যায়। মুষ্টিমেয় আত্মসম্মান সম্পন্ন বৃদ্ধিজীবী যখন কলকাতায় বাংলাকে সম্মানজনক স্থানে উন্নীত করতে চায়, তখন এ শহরের জনগণ ও যাবতীয় সংবাদপত্র সেই প্রাদেশিক উদ্যোগের বিরুদ্ধে একত্রে গর্জে উঠে, অথচ হাওড়া, শিয়ালদহ ষ্টেশনে হিন্দির দাপটে বাংলা নির্দেশিকা নিশ্চিহ্ন হলে, এই উদার বিগ্রেড সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করে। ধন্য কোলকাতার উদারতা ! নিজ বাসভূমির রাজধানী শহরকে ঠিক কী প্রকারে বহিরাগতদের হাতে তুলে দিতে হয়, কী ভাবে নিজ ভূমেই পরবাস জীবন যাপন করতে হয়, সে বিষয়ে গবেষণা করতে হলে বিশ্ববাসীকে বারে বারে এই কলকাতাতেই ছুটে আসতে হবে।

(সূত্র: পাক্ষিক দেশ, ২ ডিসেম্বর -২০০৪, কাজল চট্টোপাধ্যায়)

২. বহুভাষিতা, বহু সংস্কৃতি অবশ্যই কোলকাতার অহংকার হওয়া উচিত কিন্তু তা আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার মূল্যে নয়। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাকে অপসারিত করে রাজভাষার গাজোয়ারি সহ্য করার নাম দেশাত্মবোধ আর অবলুপ্তির দিকে ধাবমান বাংলার অস্তিত্বকে রক্ষা করার উদ্যোগ রাষ্ট্রদ্রোহিতার নামান্তর হতে পারে না। নিজ মাতৃভাষার প্রতি দরদ-ভালবাসার অধিকার সকল বিশ্ববাসীর থাকতে পারে। মগজ ধোলাইপ্রাপ্ত বাঙ্গালি জনগণ ও রাজ্য সরকারের কল্যাণে পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় ক্ষেত্র থেকেই বাংলা ভাষা নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। যে জাতি নিজ সংস্কৃতি, ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়ে, তার পতন অনিবার্য। তাই বাঙ্গালি আজ সর্বক্ষেত্রে অবনমিত হয়ে পড়েছে।

(সূত্র: পাক্ষিক দেশ, ২ সেপ্টেম্বর, ২০০৪, কাজল চট্টোপাধ্যায়)

৩. শিক্ষিত বাঙ্গালি বাবা-মা-ছেলে-মেয়ের আলোচনায় ইংরেজী-হিন্দি ভাষার ফুলঝুরি। ভাবখানা এমন যেন বাঙ্গালিত্ব ছাড়লেই পরম প্রাপ্তি। মাতৃভাষার জন্য মনপ্রাণ নিবেদিত, অথচ সন্তানকে ইংরেজী স্কুলে ভর্তির জন্য অহেতুক টাকা ঢালতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালি হয়েও পুরোপুরি বাংলা ভাষায় কথা বলতে বা লিখতে গেলে আমারা পদে পদে হোঁচট খাই। ঐতিহাসিক কারণে, সভ্যতার অগ্রগতিতে দেশি-বিদেশি নানান ভাষার মাধ্যমে বাংলা শব্দ ভান্ডার নি:সন্দেহে সমৃদ্ধ হয়েছে। তেমনই বাংলা ভাষা বা শব্দের ক্রমসংকোচনও অনবরত ঘটে চলেছে। কথ্য ও লিখিত দুই ভাষাতেই বাংলা শব্দকে পাত্তা না দিয়ে অন্য ভাষার শব্দ জায়গা করে নিচ্ছে, যে কোনও ভাব এবং মেধা-মননজাত কোনও বক্তব্য যথাযথ প্রকাশ করার জন্য বাংলায় উপযুক্ত শব্দ থাকা সত্ত্বেও ইংরেজী ও হিন্দির আকছার প্রয়োগ হচ্ছে। এ জন্য বাঙ্গালি পন্ডিত, শিক্ষক, লেখক, সাহিত্যিক, চলচিত্র-সংগীত-নাট্য জগতের কলাকুশলী কিংবা গণমাধ্যমের কর্তাব্যক্তি কেউই দায় এড়াতে পারে না। প্রগতির খর-ধারায়, বাঙ্গালির সংস্কৃতির আপন সত্ত্বা হাবুডুবু খাচ্ছে, হয়তো বা আগামী কোনও সংকর সভ্যতার কোলে তা মুখ লুকাবে। পঞ্চাশ বা একশো বছর বাদে বাংলা ভাষায় লেখা গল্প-উপন্যাস-কবিতা-প্রবন্ধে, বাংলা নাটক-চলচ্চিত্র-যাত্রা বা টিভি অনুষ্ঠানের সংলাপে দেখা যাবে অর্ধেকটাই ইংরেজী বা হিন্দি শব্দ, বাঙ্গালির জীবন যাপনে মিশ্র ভাষা-সংস্কৃতির এক উদ্ভট শৈলী। তখন সেটা কি আর বাংলা ভাষা, বাঙ্গালির সংস্কৃতি থাকবে?

(সূত্র: পাক্ষিক দেশ ২ সেপ্টেম্বর ২০০৪, অরুনাভ দাস)

৪. পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালির আত্মমর্যাদা আজ ঠিক কোন স্থানে বিরাজ করছে, তার পরিচয় এই রাজ্যের রাজধানী কলকাতায় একবার পা রাখলেই পাওয়া যাবে। মহানগরীর ব্যাংক, ডাকঘর, আয়কর দপ্তরসহ যাবতীয় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে বাংলায় নির্দেশিকা, তথা বিজ্ঞপ্তির অনুপস্থিতি, উক্ত অফিসগুলিতে কর্মচারীদের বলপূর্বক হিন্দি শিক্ষা প্রদান কিংবা আকাশবাণী তথা এফ এম রেডিওতে হিন্দি অনুষ্ঠানের ব্যাপক অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও প্রতিবাদহীন বাঙ্গালি কি প্রচন্ড সুখে কালনিদ্রায় মগ্ন।

৫. নন্দন আকাদেমি-রবীন্দ্র সদনের ওই ছোট চত্বরটির বাইরে যে বিশাল কলকাতাটা পড়ে আছে, সেখানে বাঙ্গালির কৃষ্টি ও সংস্কৃতি দূরবীণ ব্যবহার করেও চোখে পড়ে না। কিছু উজ্জ্বল ব্যতিক্রম ছাড়া মহানগরীর প্রতিটি প্রেক্ষাগৃহই মুম্বাইয়ের উদ্ধত ও অশালীন হিন্দি ছবি দ্বারা আক্রান্ত। নেতাজি ইনডোর বা যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে ক্রীড়ার চেয়ে বোম্বের নায়ক নায়িকাদের আস্ফালনই বেশি প্রদর্শিত হয়। রবীন্দ্র সদনে চিরনিন্দ্রায় শায়িতা প্রবাদপ্রতিম গায়িকা কনিকা বন্দোপাধ্যায়কে শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন না করে, ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী সে সময়ে পার্ক ষ্ট্রিটের মিউজিক ওয়ার্ল্ডে জনৈক ঋতিক রোশনের সঙ্গে বেলেল্লাপনায় মেতে ছিল। এই আজ আত্মমর্যাদাসম্পন্ন বাঙ্গালির সাংস্কৃতিক নমুনা। টালা থেকে টালিগঞ্জ সর্বত্রই হিন্দিগানের কলিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত, রবীন্দ্রনাথ, সলিলের গান অগাধ সলিলেই বিসর্জিত হয়েছে।

কলকাতার কসমাপলিটান চরিত্রকে উল্লেখ করে উদার বাঙ্গালি মহানগরীর বাংলাহীনতাকে সমর্থন করে থাকেন। তাঁরা বোধ হয় অবহিত নন যে, টরেন্টো, নিউ ইর্য়ক, বার্লিন, হংকং মুম্বাই তথা বাঙ্গালোরও কসমোপলিটান নগর হওয়া সত্বেও উক্ত স্থানগুলিতে যথাক্রমে ফরাসি ইংরেজী, জার্মান, চিনা, মারাঠি তথা কন্নড় ভাষার রাজত্ব কায়েম আছে। বিভিন্ন জাতির সমাগমে ভূমিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে নির্বাসনে পাঠানোর তো প্রশ্নই নেই, উপরন্ত উক্ত শহরগুলিতে বহিরাগতদেরকে ভূমিপুত্রদের ভাষা শিখতে বাধ্য করা হয়। অথচ বাঙ্গালি কলকাতার কসমোপলিটানিজমের দোহাই দিয়ে নিজ বাংলা ভাষাকে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সমধিস্থ করেছে। বহিরাগত হিন্দিভাষীদের ভয়ে (হ্যাঁ ভয়ে) ভূমিপুত্র বাঙ্গালিরাই নিজ ভাষা বলে না। কোহিমা, ভুবনেশ্বর, চেন্নাই, আহমেদাবাদে যথাক্রমে নাগা, ওড়িয়া, তামিল, গুজরাটিদের সদম্ভ পদক্ষেপ ও আচরণ দেখলেই আমাদের আত্মমর্যাদার রূপটা বড় নগ্নভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। আসলে আত্মমর্যাদা, জাত্যাভিমান জাতীয় শব্দগুলিই বাঙ্গালি সত্ত্বা থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেছে। স্বরাজ্যে বাস করে বাঙ্গালিরা কী ভয়ংকর নির্লজ্জের মতো আগ্রাসী হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে নি:শর্ত আত্মসমর্পন করছে। পশ্চিমবঙ্গস্থিত রেল ষ্টেশন, ব্যাংক, দূরদর্শন, রেডিও, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়গুলো বাংলা ভাষার নাভিশ্বাস তুলে ছেড়েছে। সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে যুক্ত বাঙ্গালিরা প্রতিবাদ করা তো দুরস্থান, বেতন বৃদ্ধি, প্রমোশন ইত্যাদির লোভে মরিয়া হয়ে হিন্দি শিখে নিজেদের ধন্য করছে। সাধারণ বাঙ্গালি জনগণ তো কে কতটা হিন্দিতে ডুবে বাংলা ভুলতে পারি'র তীব্র প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতকে ত্যাজ্য করে এফএম রেডিওর বলিউডি অশ্লীলতায় মেতে থাকার মধ্যে আত্মগৌরব খুঁজে পেয়েছে হিন্দি-ইংরেজী মিশ্রণে বাংলা বলা বা বাংলা একেবারেই বলতে না পারার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আজকের বাঙ্গালির গৌরব।

যুবায়ের হাসান, ঢাকা, ০৭/০৩/২০০৭